স্যানেটোরিয়াম

হোমেন বরগোহাঞি
মূল অসমিয়া থেকে বাংলা অনুবাদ : বাসুদেব দাস

রাত তখন প্রায় দুটো বাজে। জয়ন্ত চৌধুরী বিছানা থেকে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলেন। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন বোধহয়, মনে করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর মগজটা যেন হঠাৎ কেমন অসাড় হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও তিনি কোনো কিছু মনে করতে পারলেন না। পুনরায় ঘুমের জন্য চেষ্টা করার সময় পাশ ফিরতে যেতেই তার বুকের উপর কিছু যেন একটা খড়খড় করে উঠল। এক অজানা আশঙ্কায় তিনি প্রথমে ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরেই জয়ন্তের মনে পড়ল, সেটা কোনো ভয়ঙ্কর জিনিস নয়, একটি বই মাত্র।

অ্যা লোনলি ওয়ান্ডারার, আর্ট দাউ রিডিউসড টু অ্যা সিঙ্গল কাপ অফ ওয়াইন। তেরশো বছর আগের চিনা কবিতার অ্যান্থলজি একটা বুকে নিয়ে জয়ন্ত বিছানায় শুয়েছিল। এটা তাঁর এক ধরনের অসুখ। ঘুমানোর সময় কোনো একটা বই চোখের সামনে খুলে না বসলে চট করে তাঁর ঘুম আসতে চায় না। অবশ্য এটা বোঝার মতো জয়ন্তের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে যে এটা তাঁর এক প্রকার মানসিক রুগ্নতা ছাড়া আর কোনো কিছু নয়। জীবনে কোনো বই-ই সে সম্পূর্ণ পড়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ, সেই বই পড়ে শোবার সময়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে, কয়েকপাতা পড়ার পরই দুচোখ যত রাজ্যের ঘুম জড়িয়ে আসে। পরের দিন রাতের বেলা সে ভুলেও সে বইটা স্পর্শ করে না। টেবিলে স্তূপাকার হয়ে থাকা বইয়ের জঞ্জাল থেকে টান মেরে আনার সময় যে বই-ই হাতে চলে আসে সেটাকেই সে সেদিন চোখের সামনে মেলে বসে। সেটা আগাথা ক্রিস্টির শেষতম থ্রিলারই হোক বা কোনো তৃতীয় শ্রেণির আমেরিকান লেখকের বেস্ট সেলারই হোক, কোনোটাতেই জয়ন্তের অরুচি নেই। (অথবা পরোক্ষভাবে, কিছুতেই তাঁর খুব বেশি রুচি নেই)। সেজন্য শোবার ঘরের টেবিল, আলমারি, বুকসেলফ, সোফা পর্যন্ত নানারকম বইপত্রে পরিপূর্ণ। ক্যানেথ ওয়াকারের দি ফিলসফি অফ সেক্স থেকে ক্যানেথ ফিয়েরিঙের কাব্য সংগ্রহ পর্যন্ত, ডেনিস কম্পটনের দি ক্রিকেট ইজ মাই লাইফ থেকে কম্পটন ম্যাকাঞ্জির মিনিস্টার রোজ পর্যন্ত, জয়ন্ত চৌধুরীর পাঠাগারে নেই এমন বই খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বই পড়াটা যার জীবনের বিলাস, সেই ভাগ্যহীনদের কাছে চৌধুরীর পাঠাগার একটি বিরাট ঈর্ষার জিনিস। কিন্তু কেবল পাঠাগার কেন, জয়ন্ত চৌধুরীর সমগ্র জীবনটাই শতকরা নিরানব্বই পয়েন্ট না জানার কারণ মর্মন্তুদ অন্তর্দাহ এবং ঈর্ষার জিনিস। He woke up one morning and find him famous — ডিসেম্বর মাসের কোনো এক কুয়াশা-ধূসর সকালবেলা (অর্থাৎ নটার সময়) জয়ন্ত চৌধুরীর ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলেন যে তিনি প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার একটা চা বাগান এবং অসমের বিভিন্ন শহরে দুটো পাকা ঘরের মালিক হয়েছেন। জয়ন্তের বাবা হারীণ চৌধুরীর হাই ব্লাড-প্রেসার ছিল। সেদিন রাতে ঘুমোতে গিয়ে পরের দিন সকালবেলা বুড়ো আর ঘুম থেকে উঠল না। তাই বুড়োর একমাত্র সন্তান এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে এই সমস্ত কিছুই অবশ্য জয়ন্তেরই প্রাপ্য। কিন্তু কেবল তাই নয়, উত্তরাধিকারী হিসেবে জয়ন্ত বাবার কাছ থেকে লাভ করেছিল অনুপম স্বাস্থ্য এবং দেহশ্রী এবং মানসিক আভিজাত্য এবং সুস্থতা। সমস্ত দিক থেকে পরিপূর্ণ, নিখুঁত নিটোল এমন একটি জীবন যা সবারই ঈর্ষার বিষয় হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে। তবুও, তবুও। মধ্যরাতে হঠাৎ ভেঙে যাওয়া ঘুমের বিষাক্ত ক্লান্তির অন্ধকারে জয়ন্ত চোখ মেলে তাকাল। নিজেকে তাঁর খুব অসহায় আর দুর্বল মনে হতে লাগল। তার চেতনা থেকে যেন সমগ্র পৃথিবীটাই মুছে গেছে। সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে একটা পাষাণ দুর্গে সে একা বন্দি। সেই দুঃসহ চিন্তাটাকে কাঁধ থেকে ঝাঁকিয়ে ফেলে দেবার জন্য যেন, সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্লান্ত মহানগরী ঘুমে অচেতন। তথাপিও, জয়ন্তের চোখে পড়ল বহুদূরে মসজিদের উঁচু গম্বুজটা। কানে ভেসে এল দেশোয়ালিদের রাম-লীলার সংকীর্তন। হঠাৎ জয়ন্তের প্রাণে একটু আশা জাগল, ঠিক তার মতোই তাহলে নিদ্রাহীন চোখে জেগে আছে সেই ধূলি ধূসর জীর্ণ-শীর্ণ আধটো খাওয়া দেশোয়ালিরা, আর সেই মসজিদের উদ্ধত গম্বুজটাও। হঠাৎ তার খুব ভালো লাগতে লাগল। মনের নিঃসঙ্গ গভীরে সে অনুভব করতে লাগল একটা নিস্তব্ধ প্রশান্তি। ওদের মতো করে সেও রাত জেগে থাকবে, তার কণ্ঠেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে জীবনের চির জাগ্রত পরম প্রার্থনা।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজার শব্দ হল। একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে জয়ন্ত এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্থির হয়ে। তার মনের মধ্যে চিন্তার একটা নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বয়ে যেতে লাগল। একটা কথা সে স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে যে জীবনে তাঁর অনেক দুঃখ। কিন্তু কী সেই দুঃখ, জয়ন্ত সেইসব কিছুই বুঝতে পারে না। ধূপ-গন্ধ মদির শয়নকক্ষ দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শুয়েও কেন তাঁর চোখে ঘুম আসে না, সন্ধ্যার পূরবী রাগিনীও কেন তাঁর কানে বিস্বাদ হয়ে বাজে, মাঘ মাসের সকালের স্নিগ্ধ রোদও কেন তাঁর চোখে অগ্নি বর্ষণের মতো মনে হয়— এ ধরনের একশো একটা প্রশ্নের কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না। জীবন মানেই হল সময়ের একটা মাপকাঠি, যতদিন তুমি বেঁচে আছো, ততদিন পর্যন্ত সময়ের একটা বিশেষ অংশ তুমি জুড়ে আছো। সেই সময়টুকু কাটানোর সমস্যাই হল জীবনের প্রধান সমস্যা। তুমি যদি বিশ্বাস করো যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুমি সময়ের অনন্ত প্রবাহে মিশে যাবে, মৃত্যুর

সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের সর্বপ্রকার অস্তিত্বের অবসান, তাহলে তোমার হাতে থাকা সময়টুকু তুমি যেভাবেই কাটাও না কেন তার জন্য এত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কোথায়? ঠিকই তো— বেশ সপ্রতিভাবে জয়ন্ত কথাটা ভাবল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল তার প্রিয় ক্রাইস্টলারটাকে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে সে যে গতির উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলতে পারে, দূরের বাঁধন তাঁর হাতের মুঠিতে। কিন্তু হায়, ক্রাইস্টালারের লক্ষ্যস্থানও অনন্ত নয়, সমগ্র পৃথিবী ঘুরে শেষ করে সে পুনরায় এসে আগের জায়গাতেই হাজির হবে। সমাজ ব্যবস্থার যে স্তরে জয়ন্ত অবস্থিত, সেই স্তরের মানুষের জীবনে উদরপূরণের কোনো চিন্তা নেই তাই দৈহিক শ্রমেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। প্রচুর ঐশ্বর্যের বিনিময়ে যে অফুরন্ত অবসর তাঁরা হাতে পায়, তা কীভাবে কাটানো যেতে পারে, সেটাই সেই শ্রেণির মানুষের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। সেটা নির্ণয় করে তাঁদের সংস্কৃতি এবং জীবনবোধ।

অতঃপর জয়ন্ত সেন তাঁর নিজের সমস্যাটা বুঝতে পারল। এই ব্যাপারটা তো সে কোনোদিন এভাবে ভেবে দেখেনি। হরিণের মাংসই তাঁর শত্রু হওয়ার মতো, অফুরন্ত অবসরই হল তাঁর প্রধান শত্রু। জয়ন্তের শ্রেণিগত অবস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে কেবল মানসিকভাবে বেঁচে থাকতে। সেই মন যদি গভীর চিন্তার অনুকূল হয়, ওদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে কোনো বড়ো বৈজ্ঞানিক, শিল্পী অথবা অভিনেতা। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ মন নিয়ে যারা জন্মায়, তাঁরা ভেসে যাবে গলিত বুর্জোয়া সংস্কৃতির পঙ্কিল স্রোতে। জয়ন্তর বিরাম বিহীন চিন্তার একটা বিশেষ স্তরে পুনরায় সে অনুভব করে, তার সমস্যা কেবল তার নয়, তার শ্রেণির সমস্ত মানুষেরই সেই একই সমস্যা।

কিন্তু (দেওয়াল ঘড়িতে চারটে বাজার ঢং ঢং শব্দ শোনা গেল, জয়ন্তের ভালো লাগল যে সময় আর বসে থেকে নেই)। কিন্তু জয়ন্তর নিজেরই সমস্যা অনেক, অন্যের জন্য মাথা ঘামানোর মতো তার সময় কোথায়? জীবনের বাকি দিনগুলো কীভাবে নিশ্চিন্ত মনে এবং আরামে কাটাতে পারা যায়, তারই একটা সূত্র নির্ণয় করার সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ল। সেই প্রাসাদোপোম বিরাট ঘরটিতে মানুষ বলতে কেবল জয়ন্ত এবং তাঁর মা। জয়ন্তকে বিয়ে করার জন্য মা কতদিন ধরে কাকুতি মিনতি করে আসছে, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সে কাকে বিয়ে করবে? নন্দিতাকে? দেবযানীকে? মাধবী কিবং ডালিয়াকে? জীবনে প্রেমের স্বাদ সে পায়নি। প্রেম মানে যদি আত্মিক যৌন সম্ভোগ হয় অথবা কোনো একটি বিশেষ নারীর সঙ্গে যৌন মিলনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি বা পূর্ণরাগ, সে ধরনের প্রচুর অভিজ্ঞতা জয়ন্তের আছে। কিন্তু যাক সে বিয়ে করবে, সে হবে তার সন্তানের জননী। তার বিয়ের মূলে যদি জীবনের কোনো শুভ প্রেরণা না থাকে— তাহলে সেই বিয়ে তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না কি? তবু, তবু সে বিয়ে করবে। নারীর প্রেমের মধ্য দিয়ে, সন্তানের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তার আত্মার প্রসার। তার বন্দি আত্মা তখন মুক্তি লাভ করবে। সেই মুহূর্তে জয়ন্তর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল— আমি বিয়ে করব মা, আমি বিয়ে করব। নিজেকে বলতে না পেরে সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল— মা, মা।

ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা থেকে মা দৌড়াতে এল। ঘটনাটা যে এরকম পরিণতি লাভ করবে, জয়ন্ত ভাবতেই পারেনি। কীভাবে যে কি হয়ে গেল। সে এখন মাকে কী বলবে? 'মা, হঠাৎ আমার হার্টের পালপিটেশনটা বেড়ে গিয়েছিল। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এখন কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। যাও মা তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। মুখটা যথাসম্ভব বিকৃত করে নিখুঁত অভিনয়ের চেষ্টা করল জয়ন্ত। তার অভিনয় সফল হল কি? মা কয়েকমুহূর্ত জয়ন্তর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল। তার উজ্জ্বল সুন্দর চোখদুটিতে জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার শাণিত তীক্ষ্ণতা। যাও মা তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। জয়ন্ত ঢোক গিলতে গলিতে কোনোরকমভাবে বলল। 'তুই শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে'। বলতে বলতে মা চলে গেলেন।

মা, মা। জয়ন্তের চিন্তা প্রবাহে সেই একই চেতনা কিছুসময় তরঙ্গিত হয়ে থাকবে। তার বিদগ্ধ মনটি হঠাৎ কল্পনা করতে আরম্ভ করল, ঠিক বোদলেয়ারের মতো সেও যেন গভীরভাবে ইচ্ছা করে কোনো এক দানবীর মনোযোগ আকর্ষণ করার, তার চোখ নিজেকে একটা পোষা জন্তুর মতো দেখার, 'একটি অভিজাত সমাজের কোলে একটি বিড়ালের কামাতুর, উদণ্ড মসৃণ জীবন-যাপন করার।' সেই দানবী হল তার মা। তিনি জয়ন্তীকে কেবল জন্ম দান করেই নিষ্কৃতি দান করেননি, বংশ পরম্পরা, জীবন-মৃত্যুর চেতনা, প্রেম-ঘৃণা এবং স্বার্থপরতার নাগপাশে ঠিক একজন দানবীর মতোই তাঁর অনন্ত বিস্তৃত মাংসল বাহু দুটি দিয়ে তার সমগ্র জীবন জড়িয়ে ধরে রেখেছে। জয়ন্তর ইচ্ছা করে, জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করে যেন সেই দানবীর বিশাল কোলে, হিমালয়ের মতো উত্তুঙ্গ স্তন দুটির রসধারা চুষে চুষে চিরশিশুর মতো পরম নির্ভতায় সে শুয়ে থাকবে। তার মা একদিন মারা যাবে, সে কথাটা মনে পড়লেই ভয়ে তাঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠে। মায়ে মৃত্যু মানেই যেন জয়ন্তর নিজের অস্তিত্বেরও সমর্থ সার্থকতার অবসান। জয়ন্তের দুর্ভাগ্য তাড়িত বহু বিড়ম্বিত জীবনের এই দুশ্চিন্তাও কম বড়ো সমস্যা নয়।

পরমুহূর্তেই জয়ন্তের নিজের উপর খুব ঘৃণা হতে লাগল। পাঠাগারের অন্ধকার কোনো বসে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করার সময়, সমস্ত জিনিসকেই সম্ভবপর সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখা তার একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আর সেই পরীক্ষা থেকে তার মা-ও বাদ পড়েনি। ছিঃ তার এত স্নেহময়ী মাকে সে কী চোখে দেখছে। জয়ন্তের মা তার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এখনও বয়স চল্লিশ পার হয়নি। দেখলে ত্রিশ বছরের মনে হয়। অপরূপ সুন্দরী, মুখটা সর্বদা আবেগে ঢলঢল হয়ে থাকে। জয়ন্ত মাঝে মধ্যে ভাবে, সে আর তার মা উভয়ে যেন পরস্পরকে চুরি করে নিরীক্ষণ করে চলেছে, একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে দুজনেই দুটি পৃথক ব্যক্তি সত্তা, দুজনেই

দুজনের শত্রু। জয়ন্ত ভাবে, ঘুম থেকে উঠে থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘসময়টুকু তার মা শরীরের নরম মাংসের স্তূপ, আর তার চেয়েও কোমল একটা মন নিয়ে কীভাবে দিনের পর দিন কাটায়? তাঁর স্বর্গত স্বামীর চিন্তা করে? জয়ন্ত ভালোভাবেই জানে, তার বাবা এবং মায়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। পুরোনো ভারতীয় ঐতিহ্যে বৈধব্যের একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ছিল। কিন্তু জয়ন্তের শ্রেণির নতুন সভ্যতা এবং জীবনবোধ সেই আদর্শ ভেঙে দিয়েছে। নতুন কোনো আদর্শ কারও চোখের সামনে তুলে ধরা হয়নি। জয়ন্ত তার ক্ষুরধার বুদ্ধির আলোতে বিচার করে দেখেছেন, তার মা সবসময়ই অসুখী, অশান্ত। অতৃপ্ত দৈহিক সম্ভোগের বাসনা এবং মানসিক নিঃসঙ্গতা তার জীবনে এনে দিয়েছে গভীর নিরাশা। সেই অসংযম এবং অতৃপ্তির অনেক বাহ্য লক্ষণ জয়ন্ত তার মায়ে জীবনে লক্ষ করেছে। মানসিক সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত হয়ে তিনি আজ তার সমাজের হাতে গড়া নতুন জীবন-বেদের শূন্যগর্ভতার পরিচয় হবন করছে?

জয়ন্তের মনের ঠিক এরকমই একটি অশান্ত অবস্থায় তার অনিমার কথা মনে পড়ল। মানুষের জীববোধ বলা জিনিসটি জন্মগত নয়, তার বাইরের প্রভাবে গড়ে উঠে। মহিলাদের প্রতি জয়ন্তের যে মর্বিড মনোভঙ্গি, তারজন্য অনিমাও কি কোনো অংশে কম দায়ী? ...একটি স্থানীয় প্রভাবশালী দৈনিক কাগজের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্ত উৎসবে অনিমা কথক নৃত্য পরিবেশন করেছিল। শিবের আশ্রমে অকাল বসন্তের আবির্ভাব, মদনের ফুল শরে শিবের ধ্যানভঙ্গ, উমার উন্মুখ প্রতীক্ষা-সৃষ্টির বিরাট স্বপ্ন এবং মৃত্যুর আবেগ, একটা একটা করে ফুটে উঠছিল অনিমার দেহের লয়লাস্য ছন্দে। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের চোখের সামনে উন্মোচিত হয়ে উঠছিল জীবনের অজ্ঞাত রহস্যের একটি যবনিকা। উৎসবের শেষের জয়ন্ত নিজে গিয়ে অনিমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। সেদিন জয়ন্তের মধ্যে অনিমা কী দেখেছিল, কে জানে? অনিমা উপযাচিকা হয়ে জয়ন্তকে একটা বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। পরম আগ্রহের সঙ্গে জয়ন্ত অনিমার বাড়িতে গেল। ফিরে এল, এক অনাস্বাদিত তৃপ্তির (অথবা অতৃপ্তির) উত্তেজনা নিয়ে। দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে অনিমা না-হলে তার জীবন চলে না। সেই মুহূর্তে সে অনিমাকে চিঠি লিখল: অনু, এই মাত্র রেডিয়োটা খুলে কোনো এক অদৃশ্য গায়িকার কণ্ঠের কোমল গান্ধার শুনতে শুনতে, হঠাৎ আমার অনুভব হল, সেই গায়িকা যেন তুমি। জীবনে যে মধুর, যে মনোহর, সে সুন্দর— সেই সমস্ত কিছুই যেন তুনি। তুমি আমার কল্পনার সেই ভয়ঙ্করী দানবী— যার আত্মার প্রলয়ান্ধকারে আমি অনন্তকাল শুয়ে থাকব— অনন্তকাল— কোনোদিন আর জ্ঞান ফিরে জেগে উঠব না জেনো। আমি আর অপেক্ষা করব না অনু। তোমার আত্মার দুর্গা দ্বারে কঠিন আঘাত করে হলেও আমি ভেতরে প্রবেশ করব। 'উত্তরে অনিমা লিখল : জয়ন্ত, এইমাত্র 'জয়ন্ত স্বপ্নভঙ্গ' নৃত্যটির পরিকল্পনা করার সময় আমি হঠাৎ চমক খেয়ে থমকে গেলাম, তুমিই যেন সেই ক্ষুধিত পাষাণ, সেই অবিনাশী প্রাণ, সেই অমর স্বপ্ন। দাউ সাইলেন্ট ফর্ম, ডস্ট দাউ টিজ আস আউট অফ থট অ্যাজ ডথ ইন্টারনিটি। জীবনে যে প্রচণ্ড, যে দানবীয়, যে দুর্বার সেই সমস্তই যেন তুমি। তুমি এসো, তুমি এসো, আমাকে শূন্য করো, আমাকে পূর্ণ করো। তুমি যে শ্রেয় এবং প্রেয় দুটিই।'

এই তাহলে প্রেম? জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবল। সময় যে কীভাবে পার হয়ে যায়, সে এখন বলতে পারে না। এই মধুর স্বপ্নের যেন আর শেষ না হয় ঈশ্বর। তার পর কোনো একদিন, কোনো এক দুর্লভ মুহূর্তে সে অনিমাকে লিখল— অনু, আমি মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব রেখেছি। তুমি প্রস্তুত হও। 'উত্তর অনিমা লিখল, 'জয়ন্ত আজও আমি বুঝতে পারলাম না, আমার মন কী চায়। তোমাকে যে আমি অন্তর উজাড় করে দিয়েছি, আমার প্রেম, আমার যৌবন, আমার দেহ— কিছুই বাকি রাখিনি। তবুও তুমি সুখি হতে পারনি। জানো জয়ন্ত, আমি বিবাহিতা, তিনটি সন্তানের জননী আমি, আমার স্বামী রূপে গুণে তোমার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। তুমি হয়তো ভাববে, তবুও আমি তোমার কাছে কেন ছুটে গিয়েছিলাম? এটাও হয়তো নারী হৃদয়ের এক চিরন্তন বিস্ময়। তোমাকে আমার প্রয়োজন, কারণ তোমার অপরূপ সুন্দর দেহের সান্নিধ্যে আমার ভেতরে সুপ্ত পাষাণী নর্তকী জেগে উঠে, সে স্বপ্ন দেখে, নেচে নেচে জীবনের পরম প্রার্থনাকে মূর্ত করে তোলার। তোমাকে আমার প্রয়োজন, কারণ তোমার উজ্জ্বল প্রশংসমান চোখজোড়ায় আমি দেখতে পাই— প্রতিটি নারীর অন্তরে পুরুষের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার যে অদম্য লোভ লুকিয়ে থাকে— তার চরম পরিতৃপ্তি। তোমার মুখে আমার রূপের স্তবগান শুনে শুনে কোনোদিনই আমার আশা মেটে না। তা শোনার জন্য বারবার তোমার কাছে ছুটে যাই। ঠাণ্ডা মাথায় আমি কথাগুলো ভেবে দেখেছি, তোমাকে আমি কোনোদিনই ভালোবাসিনি, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকেই ভালোবাসতে শুরু করেছি, আরও বেশি করে। তুমি যেন আমার কাছে একটা দর্পণ, যার মাঝে আমি নিজেকে দেখতে পারি, নিজেকে বিচার করতে পারি। তোমার মনের দর্পণে আমি নিজেকে দেখে, নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলি আমার স্বামীর কাছে নিজেকে নিবেদন করার জন্য। এর থেকেই তুমি বুঝতে পারছো তুমি কেবল আমার কাছে আসছো না, আমার স্বামীর কাজেও আসছো। ...এত সহজে বিয়ের প্রস্তাব না তুললে আরও কিছুদিন তোমাকে আমি আমার আত্ম-রতির উপযোগী দর্পণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু... এর পরেও আর সেটা সম্ভব নয়। ধন্যবাদ। এরকম প্রেম বন্ধু... অথবা, এটাই জীবন। তোমরা পুরুষরা বড়ো বেশি ভাবপ্রবণ। আমাদের মতো ব্যবহারিক জ্ঞান তোমাদের নেই। Means- কেই End বলে আমরা কোনোদিনই ভুল করি না।

A Sadder and a wiser man

He rose the merrow morn

*** *** *** ***

ভোর হতে এখনও আরও এক ঘন্টা বাকি। আবোল তাবোল চিন্তা করে এবং একটি সন্তোষজনক সমাধানে না পৌঁছাতে পেরে— জয়ন্ত খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হাত পা মেলে সে জায়গাতেই বসে পড়ল। অনিদ্রাজনিত ক্লান্তিতে তার মাথা গরম হয়ে উঠেছে, কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে। কিছুক্ষণ পরে খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাল প্রবেশ করল। নাকে এলো বাগানের হিমার্ত এবং স্নিগ্ধ গন্ধ লাগল। জয়ন্ত বেশ আরাম বোধ করল। একটি মধুর অবসাদে তার চোখদুটো বুজে এল।

...সে এসে খোলা জানালাটার পাশে বসল। সূর্য অস্তায়মান। সূর্যাস্তের সময়ের এই আশ্চর্য রূপ— পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয় না। আকাশ এবং পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরা সেই বিরাট আবেগ— যা মানুষের সমগ্র চেতনাকে মথিত করে অবশ করে তোলে, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার বেদনাটুকু অনুভব করার জন্য জয়ন্ত এই বিকেলের সময়টুকুতে উন্মুখ হয়ে থাকে। রোল অন, ডাই ডিপ অ্যান্ড ডার্ক ব্লু ওসেন -রোল। জয়ন্তের খুব ভালো লাগে। তার সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষিত জায়গাটুকু সে খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা করে, তার অসুখ যেন আর ভালো না হয়। মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত এই স্যানেটোরিয়ামে থাকতে পেলেই সে সুখি হবে। বাইরের সমস্ত পৃথিবীটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিরোগ এবং সুখি জীবন সম্ভব কেবল মাত্র লোকালয় থেকে বহুদূর সমুদ্র পারের এই মনোরম স্যানেটোরিয়ামে। সমুদ্রের বুকে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জয়ন্ত চোখের পলক ফেলতে পারে না। অ্যান্ড ডেথ ইজ নো ইভিল। তার অতি প্রিয় রবিনসন জেফার্সের নাইট কবিতাটি গুণ গুণ করে সে গাইতে থাকে। অ্যান্ড ডেথ ইজ নো ইভিল। সঙ্গের রোগীদের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস, অনুচ্চারিত হা-হুতাশ, সমস্তই তার কানে আসে। কিন্তু জয়ন্ত সমস্ত কিছুর প্রতিই উদাসীন। লম্বা শ্বাস টেনে সমুদ্রের লবনাক্ত বাতাস বুকের ভেতর টেনে নেয়, আর অনুভব করে, সে সত্যি সত্যিই খুব সুখি। ...ধীরে ধীরে রাত হয়ে আসে। জয়ন্ত জানালার কাছ থেকে উঠে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। একজন আধবয়েসী নার্স তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁর মুখে সেই চির রহস্যময়ী হাসি এবং চোখে অন্তহীন ক্লান্তি। এই নার্সটিকে জয়ন্তের খুব ভালো লাগে। তাঁর প্রতি জয়ন্ত একটা উষ্ণ উত্তেজনা অনুভব করে। মাঝে মধ্যে রাগও হয়। জয়ন্তকে এটা করবে না, ওটা করবে না বলে প্রায়ই নানারকম বাধা নিষেধ আরোপ করে থাকে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে নার্সটিকে জয়ন্তের খুব ভালো লাগছে। তার দিকে জয়ন্ত স্থিরভাবে চেয়ে থাকে। কাছে এগিয়ে আসতেই মনের উল্লাসে সে সজোরে ডেকে উঠে— সিস্টার! কপালে কারো ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করে জয়ন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে, তার মা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কিন্তু স্বপ্ন দেখছিল নাকি জুনু? সিস্টার বলে কাকে ডেকেছিলি?' জয়ন্ত কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় হতভম্ব হয়ে থাকে। যখন তার সমস্ত কথা মনে পড়ল, তখন সে আরও বেশি করে হতভম্ব হয়ে গেল। সে যে কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল। তার নিজের মাকে স্যানেটোরিয়ামে নার্সের রূপে দেখতে পেয়েছিল, সে কথা সে মাকে কীভাবে বলবে? মাথাটা খুব ধরেছে, এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো। মা চলে গেলেন।

জয়ন্ত উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। রোদের তাপে জয়ন্তর উজাগরে থাকা চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল। গতরাতের উলটোপালটা চিন্তা এবং আশ্চর্য স্বপ্নের কথা ভেবে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেবল ঐশ্বর্য এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য মানুষকে জীবনের সুস্থ উপভোগের পথ মুক্ত করে দিতে পারে না— জয়ন্ত নিরুপায় হয়ে ভাবল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে, বহুদূর দৃষ্টি মেলে দিয়ে জয়ন্ত দেখল, শান্তির সন্ধানে অন্য একটা স্যানোটোরিয়ামের খোঁজে যাবার দরকার নেই, সমগ্র জগতটাই একটা বিশাল স্যানেটোরিয়ামে পরিণত হয়েছে। জয়ন্ত অনুভব করল তার চারপাশের বাতাসও যেন কোটি কোটি ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তার নিঃশ্বাস নিতে কেমন যেন ভয় করতে লাগল? ...অ্যান্ড ডেথ ইজ নো ইভিল।'